Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পিঞ্জরে বসিয়া শুক : কমলকুমারের জীবনদৃষ্টি ও রচনাশৈলী

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.1
Pages	৯-২৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পিঞ্জরে বসিয়া শুক : কমলকুমারের জীবনদৃষ্টি ও র

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) পাঠকদের অনেকের মত এই যে, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* (১৩৮৫) লেখকের — এবং বাংলা ভাষারও — দুরূহতম উপন্যাস[১]। এর ভাষা ও ভঙ্গির দুরূহতার ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বিষয়ের জটিলতার কথাও বলেছেন। কিন্তু বিষয় ও ভাষা-ভঙ্গির পারস্পরিকতার দিকটি খুব কম ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়, ভাষা ও ভঙ্গির জটিলতা আরো কম হতে পারত। তাতে পাঠকের পক্ষে উপন্যাসটির 'মূল্যবান' ভাবলোকে আরো ভালোভাবে প্রবেশ করা সম্ভব হত। সাধারণত এসব বিবেচনায় উপন্যাসের বিষয় আর ভাষা-ভঙ্গিকে আলাদা করে ভাবা হয়, কিংবা অন্তত অদ্বৈত ভাবা হয় না। তাছাড়া ভাষা বলতে বোঝানো হয়, মোটের উপর, ব্যাকরণিক বিধি-বিধানের সমষ্টিকে। আরো গভীরে, ভাষা যেখানে জীবনের বাগ্বিধি ধারণ করে স্বয়ং জীবনের রূপ পায়, বা শব্দ বা বাক্যাংশ যেখানে স্বয়ং জীবন ও উপলব্ধির নতুন সংজ্ঞা হয়ে ওঠে, সে স্তরে তত্ত্ব-তালাশ বেশি করা হয়নি। লম্বা ও জটিল বাক্য, উপবাক্য বা অন্তঃবাক্যাংশের ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্যভাষার প্রভাব যতটা খোঁজা হয়েছে, লেখকের বিশেষ মুদ্রা(দোষ) যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, বিষয়ের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসাবে ততটা দেখা হয়নি।

অথচ কমলকুমারের ক্ষেত্রে অন্যরকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। শুরু থেকেই সচেতন নির্মাণের এক বর্ণাঢ্য উদযাপন হিসাবেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন[২]। সত্য বটে, তাঁর কিছু কিছু মুদ্রার অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি পাঠক্ষমতাকে বিব্রত করে, এবং এর কোনো কোনোটি উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্যবহৃত হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে, পরেও আর ফিরে আসেনি। কিন্তু এ সবকিছু নিয়েই কমলকুমারের গদ্য। তাছাড়া এখানে টেক্সটের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটিও উপেক্ষা করার মতো নয়। বর্তমান নিবন্ধে *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* উপন্যাসটি পঠিত হবে একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা হিসাবে — বিষয় ও ভঙ্গির অভেদ-কল্পনায়; অন্যদিকে আবার লেখকের ভাবলোক আর রীতিপদ্ধতির কিছু সাধারণ সূত্র উন্মোচনেরও চেষ্টা থাকবে। উপনিবেশিত বাংলার সার্বিক বিচ্ছিন্নতা আর বিচ্যুতির জরিপ চালানো এবং সামষ্টিক সত্তার পুনরুদ্ধার-প্রকল্প কমলকুমার মজুমদারের জীবনসাধনার মূল স্তম্ভ। রামকৃষ্ণের 'ভাব বিগ্রহ' আর রামপ্রসাদের 'কাব্য বিগ্রহ' রচনার যে দাবি তিনি *অন্তর্জলী যাত্রার* ভূমিকায় করেছেন, তা নিহিতার্থে সেই বিচ্ছিন্নতার রূপাঙ্কন ও সংযুক্তির প্রস্তাবনা। *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*, আমাদের প্রস্তাব, উক্ত রূপ ও প্রস্তাবনার ভালো নমুনা।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১

পিঞ্জরে বসিয়া শুক হারানোর গল্প। হয়ত পাওয়ারও। অন্যভাবে বলা যায়, বিযুক্তি আর সংযুক্তির কথামালা। কিন্তু এই দুই দিক সমতুল্য নয়। ঔপন্যাসিকের পরিচর্যা আর নিশ্চিতির দিক থেকে সমমূল্যের নয়। হারানো বা বিযুক্তির দিকটা যত পষ্ট, ফিরে পাওয়ার বা সংযুক্ত হওয়ার দিকটা ততটাই গোলমেলে। বাস্তবেও হয়ত তাই। মুশকিল হল, 'ঘোর বাস্তবের' লেখক[৩] কমলকুমার আমাদের চেনাজানা বাস্তবের এত বিচিত্র লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে যান, অপরিচিতির এমন রহস্যময়তা তৈরি করেন, যে, কোনো অব্যবহিত বাস্তবের বরাতে লেখক-নির্মিত বাস্তবের সাথে সহজে সম্পর্কিত হওয়া যায় না। লেখক নিজের যে দুনিয়ায় পাঠককে ডেকে নেন, সে তো নির্মিত-জগৎই বটে, বাস্তবের জগৎ নয়। কিন্তু বাস্তব জগতের সাথে এর নানা রকমের পারস্পরিকতা থাকে। এই পারস্পরিকতা ছিন্ন হলেই রচনা দুরূহ হয়। নির্মিত-দুনিয়ায় রচনাকারের সাথে বেরিয়ে পড়তে বেগ পেতে হয়। কমলকুমারের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটে।

একেবারে শুরুর বাক্যে লেখক অবশ্য হারিয়ে যাওয়ার সংবাদটা খোলাখুলিই দেন : 'তখনই যে সময়ে সুঘরাই হারাইয়া যায় ...'। মনিব এবং মনিবপত্নীর কাছ থেকে হারিয়ে যায়। সুঘরাই অধম ডোমজাতীয় বালক। অচ্ছুত। সভ্য মানুষের যাবতীয় কর্ম, অধিকার বা অনুভব থেকে বঞ্চিত। 'তীব্র আতান্তরে' পড়ে সে তার মনিবকে খোঁজে। মনিবও খোঁজে তাকে। এই খোঁজাখুঁজিতে উপন্যাসের অন্তত অর্ধেক জায়গা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু পাওয়ার সংবাদটি মেলে না। এর মধ্যেই এই অসামান্য খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে। পাঠকের এমত বোধ হয় যে, খোঁজাটাই মুখ্য; প্রাপ্তিযোগ নয়। কমলকুমার বলেন বটে, বেশ ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই বলেন; কিন্তু তাঁর বয়ানে দেখা আর দেখানোর কাজটাই প্রধানত ঘটে থাকে। সেই বলা আর দেখানোর মধ্যে কাহিনি বর্ণিত হয় না। চরিত্র 'বিকশিত' হয় না। তৈরি হয় একরাশ বোধ। বোধগুলো জমাট বেঁধে শনাক্তযোগ্য আকার পাওয়ার বদলে তৈরি করতে থাকে গভীর কিন্তু অনির্দিষ্ট প্রতীতি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এবং এ লেখায়ও, কমলকুমার আড়াআড়ি বা খাড়াখাড়ি কথা বাড়ান না। অন্তত সরলরৈখিকভাবে বাড়ান না। গল্পের গতি মূল বিন্দু থেকে চারপাশে বিস্তৃত হতে থাকে। নিরাকার ক্ষেত্র তৈরি করতে থাকে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে, কমলকুমার সাধারণত ব্যক্তির গল্প বলতে চান না। সমষ্টিই তাঁর অবলম্বন[৪]। তাঁর লক্ষ্য ভাবলোকের আবিষ্কার আর রূপায়ণ। রূপায়ণ-পদ্ধতির সতর্ক অনুসরণের মধ্য দিয়েই ভাবলোকের ধারণাটা আকার পেতে থাকে। নিরাকার আকার।

সুঘরাই হারিয়ে যাওয়ার পর সে ওই 'দিব্যমাল্য সাজান, ভাস্বর, হীরক-শোভাতে বিনিদ্র শহরে' তার মনিবকে খোঁজে। অন্তত ২০/২১টি স্থানে খোঁজে। শুধু খোঁজে না, দেখেও। এই দেখার কাজটি আসলে করেন লেখক স্বয়ং। সুঘরাইয়ের পক্ষ হয়ে করেন। কিন্তু সুঘরাইয়ের ভাষায় নয়। নিজের ভাষায়। দ্রষ্টব্য বস্তুর ধর্ম ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা তাতে অনুপুঙ্খভাবে স্থান পায়। বাইরের ক্রিয়ার সাথে অন্তরের প্রতিক্রিয়া এবং সম্ভাব্য অনুভূতি-আবেগ-প্রভাব প্রতি মুহূর্তে চিহ্নিত হতে থাকে। প্রতিটি কাজই হয় অতিশায়িত

ভাষাভঙ্গিতে। যেন বস্তু নয়, বস্তুর ভেতরের আভাই তাঁর দ্রষ্টব্য; যেন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার উচ্চারিত রূপ নয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সাথে জড়ানো-প্যাঁচানো 'প্রকৃত' সত্যই তাঁর বক্তব্য। তাহলে প্রতিটি মুহূর্তের সচিত্র প্রতিবেদনে হাজির থাকছেন লেখক স্বয়ং — দ্রষ্টার ভূমিকায়; একই সাথে দ্রষ্টব্যের দৃশ্যমানতা আর অন্তরঙ্গতার ছবিও হাজির। এ দুইয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে সমীকৃত হতে থাকে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের — এক্ষেত্রে সুঘরাইয়ের — দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রতিক্রিয়া। ব্যক্তিকে কম সক্রিয় করে ব্যক্তি-বস্তু-ঘটনা সম্বলিত সমষ্টির সক্রিয় দৃশ্যায়ন এই বর্ণনাভঙ্গির আরেক বৈশিষ্ট্য। একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

একেবারে প্রথমেই সুঘরাই মুখোমুখি হয় এক সাধকের। সে তখন এক হারিয়ে যাওয়া ক্রন্দনরত বালক। কিন্তু লেখক বলছেন, তার 'কান্দনে' 'প্রচ্ছন্ন ছিল কূট বিদ্বেষজনিত ক্রোধ'। এই ক্রোধ এসেছে ওই সাধকের কায়কারবারে। লেখক তার বাইরের বর্ণনা দেন : তার নেত্র হিঙ্গুল, চেহারা বৈরাগ্যসুন্দর দশাসই, গাত্র মসৃণ ও উজর তাম্রবর্ণের ইত্যাদি। এরপর তার কাজের বর্ণনা : হাতের চিমটা দ্বারা মন্দিরের দরজার চৌকাঠে বারবার আঘাত করা, ত্রাসসঞ্চারী হুঙ্কার, চিৎকার করে 'শালা... অদ্য আমারে দর্শন দিতে হইবে, আমি কণ্ঠে ফিরিয়া আসিতে চাহি না, দে শালা অখণ্ডতা!' ইত্যাদি বলা। এই ফাঁকে সুঘরাই সম্পর্কে ছোট্ট বর্ণনা : 'সুঘরাই কিছু আড়ষ্ট, কিছু কৌতূহলী'। এরপর সমবেত ভক্ত-দর্শকের আহাজারির বয়ান। সাধকের 'অন্তর্দ্দশাপ্রাপ্তি'। তার শুশ্রূষা। 'ইহজগতের সহিত সম্পর্ক গঠিত হওয়া'। লেখক বলছেন, সুঘরাই এই সাধককাণ্ডের 'প্রহেলিকা' বা 'সরলতা' বা 'বীরত্ব' বুঝতে পারেনি, শুধু সাধকের 'দুর্দ্ধর্ষতা' গ্রহণ করেছে। শুরুতেই যে ক্রোধের কথা বলা হয়েছিল, এখানে তার উৎস পাওয়া গেল। এই সূত্রেই লেখক সুঘরাইয়ের মনিবপত্নীর কথা বলবেন। তাকে যে শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল বোদ্দিনাথের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে, সদাশয় মনিবপত্নী কাতরকণ্ঠে বলে দিয়েছিলেন বারবার, ক্রোধবশত সে তা করতে পারেনি। ক্রোধটা সে পেয়েছে, লেখক বলছেন, সাধকের কাছ থেকে। সাধকের 'প্রহেলিকা', 'সরলতা', 'বীরত্ব' আর 'দুর্দ্ধর্ষতা'র মধ্য থেকে সে গ্রহণ করে শেষেরটি। কেন? লেখক এক বাক্যে সম্ভাব্য কারণ দর্শিয়েছেন : '... রোষে সেও জ্বলিতেছিল — সম্ভবত, কেন না তাহারই ছায়া বাঁচাইতে ব্রাহ্মণ্য শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডাঠাকুর মহাশয় ঈষৎ দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ত স্বীয় উড়নীতে সামাল দিয়াছিলেন;'। লেখক চান পরিপূর্ণ ছবি — বহুতলিক, বহুকৌণিক; ভিতরের ও বাইরের; বস্তুর ও ঘটনার; ব্যক্তির ও সমষ্টির; স্থাবর ও জঙ্গম। এবং অবশ্যই এদের প্রত্যেকটির পারস্পরিকতা। এর মধ্যেই পরের কার্য থেকে পাওয়া কারণ ব্যবহৃত হয়ে যায় আগেই। সংশ্লিষ্ট কোনো অনুষঙ্গ মনে করিয়ে দেয় আগের ঘটনা, ডেকে আনে পরেরটি।

সুঘরাইয়ের মনিবও তাকে খোঁজে। লেখক আমাদের সে ইঙ্গিত দেন (কমলকুমার, ২০০২ : ২৭২-৭৩)। কিন্তু মনিবের সরাসরি খোঁজার বর্ণনা নেই। আছে এমন ভঙ্গিতে যে, সুঘরাই ভাবছে, তার মনিব তাকে খুঁজছে। কোথায় খুঁজছে? ঠিক এই মুহূর্তে সে যেখানে আছে সেখানে, যেমন, গণৎকারের সামনে (কমলকুমার, ২০০২ : ২৭৭-৭৮)। তার মনিব গণৎকারকে কী বলবে? সুঘরাই পুরো ব্যাপারটা কল্পনা করে। এই কল্পনায় যথারীতি চারপাশের নিখুঁত ছবি আছে। গণৎকার যা করছে, যার সাথে করছে — এক্ষেত্রে এক

'বর্ষীয়সী মহিলা' — তার সুঘরাইয়ের দৃষ্টিতে নির্মিত ভাষ্য আছে। গণৎকারের সামনে থেকে সুঘরাইয়ের যেসব কথা মনে আসছে, তার সাথে অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িয়ে পড়ছে তার অতীত ও বিস্রস্ত বর্তমান। সেসবের তাপ-ভাঁপ বহন করছে এ বর্ণনা। আসলে পুরো বর্ণনাটা গড়নের দিক থেকে আরো জটিল। বর্ণনাটা মনিবের। ক্রিয়াটা বা অবস্থাটা সুঘরাইয়ের। সুঘরাই ভাবছে যে তার মনিব তার সম্পর্কে এরকম বলছে। এই ভাবনার মধ্যে মনিবকে সে কোনরূপে, তার সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চায়, তার পরিচয় আছে। অথচ পুরো বর্ণনায় সুঘরাই বা মনিবের ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত হয়নি। ভাষাভঙ্গিটি মুখ্যত লেখকের। অতিশায়িত বর্ণনা। অন্তর্ভেদী বর্ণনা। বিশেষ ও সার্বিককে চরম মূল্য দিয়ে, এ দুইয়ের পারস্পরিক সংহতি রক্ষা করে, পরস্পরের খোঁজে ব্যস্ত দুই ভিন্ন কোটির দুই মানুষের প্রত্যেকের এবং পরস্পরের গভীর পরিচয়জ্ঞাপক বয়ানের জন্য এই জটিল উপস্থাপনরীতি বেশ কার্যকর হয়েছে। খোঁজাখুঁজির এই দীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপনরীতির এই বিশিষ্টতা আরো ইঙ্গিত দেয়, তারা হয়ত নিজেদেরই তালাশ করে, কিংবা অন্যের চোখে নিজেকেই দেখতে চায়। সূক্ষ্ম বাস্তবসম্মিতির প্রচণ্ডতায় চলমান বর্তমান থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু উপস্থাপনরীতির এই জটিল সমবায় হয়ত টেক্সটের রূপক-সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তোলে।

২

উপন্যাসটির পটভূমি রিখিয়া[৫] ও সংলগ্ন কোনো শহর। ডোম, সাঁওতাল ইত্যাদি অনার্য জনমানুষের বসবাস রিখিয়ায়। কলকাতা বা অন্য শহরের বাবুরা হাওয়া বদল করতে যায় সেখানে। লেখকের ভাষায়, এরা 'চেঞ্জার'। চেঞ্জারদের মধ্যে এক দম্পতি গৃহভৃত্য হিসাবে নিয়োগ দেয় অচ্ছুত বালক সুঘরাইকে। তারা তিনজনে নিকটবর্তী শহরে বৈদ্যনাথের মেলায় তীর্থগমন করে। সেখানে হুল্লোড়ের মধ্যে সুঘরাই হারিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সুঘরাই বা মনিব কেউ কাউকে খুঁজে পায়নি। বিরাশি পৃষ্ঠার উপন্যাসে পৃষ্ঠা পনের বাকি থাকতে সুঘরাই খুঁজে পায় স্বজাতি ঢাকি বিসরিয়ার বাপকে। তার সাথেই সে রিখিয়ায় ফিরে আসে। অবশ্য এর আগেই বিভিন্ন অনুষঙ্গ-সূত্রে সুঘরাই আর মনিব-মনিবপত্নীর পর্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া গেছে। ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহে নয়, কিন্তু টুকরা টুকরা ছবিতে খুব নিপুণভাবে নির্মিত হয়েছে মনিব-দম্পতির সাথে সুঘরাইয়ের সম্পর্ক। সে সম্পর্কের অনিবার্য উপাদান হিসাবে, সুঘরাইয়ের নির্ণায়ক চিহ্ন হিসাবে, ক্রমশ রূপ পেয়েছে পিঞ্জরাবদ্ধ এক তিতির। সুঘরাইয়ের প্রত্যাবর্তনের আগে বেশ ধারাবাহিক লম্বা বর্ণনায় পাওয়া গেছে রিখিয়ায় বেড়াতে আসা বাবু-বিবিসমাজের পরিচয়। এক সাঁওতাল নৃত্যানুষ্ঠানকে ঘিরে বসেছিল বাবু-বিবির আসর। তাতে পাখিসমেত সুঘরাই আর তার মনিব-দম্পতিও হাজির ছিল। চৌকস সংলাপে আর সম্পর্কের বহুকৌণিকতায় উদঘাটিত হয়েছে কলকাতার নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট টীকাভাষ্য।

শহর থেকে ফেরার পর সুঘরাই দিনকে দিন বদলে যেতে থাকে। সে তার তিতির পাখির খাঁচাটিকে নানা আভরণে সাজিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য সৌন্দর্যের পসরা সাজায়। একাজে মনিবপত্নীরও আশকারা ছিল। খাঁচাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আঘাতে, অবহেলায়

ও বিষক্রিয়ায় পাখিটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সুঘরাই পাখিটিকে ভদ্ররূপে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু নিস্তেজ পাখিটি তার অসম্মানের কারণ হয়। সে জোর করে পাখির হারানো তেজ ফিরিয়ে আনতে চায়। তার পদ্ধতিগুলো ব্যর্থ হলে শেষে ক্রোধবশত — হয়ত অজান্তেই — সে পাখিটিকে হত্যা করে।

কাহিনি না বলে একে কাহিনিরেখা বলাই ভালো। সেই কাহিনিরেখা থেকে আড়ে-দিঘে অসীম ব্যঞ্জনাময় যে আলেখ্য কমলকুমার তৈরি করেন, তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বস্তুধর্ম তথা বিশেষকে পরম মূল্য দিয়েও সার্বিক বা সামান্যের জন্য ততোধিক পরিসর তৈরি করা। নিরাসক্তির যথাবিহিত প্রদর্শনী অক্ষুণ্ন রেখেও লেখকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা[৬]। গদ্যের কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি গড়ে তাতে কাব্যিক প্রসারতার ইনতেজাম করা। তাতে করে বয়ানের বিভিন্ন অংশকে এবং সমগ্রকে রূপকী-প্রতীকী তাৎপর্যে পাঠ করার শুধু সুযোগ নয়, অবশ্যম্ভাবিতা তৈরি হয়। সুঘরাই-তিতির উপাখ্যানকে রূপক হিসাবে পড়বার প্রত্যক্ষ ইশারা ঘটনাক্রমের মধ্যেই আছে; লেখকের দিক থেকেও নানাভাবে পাঠককে এর অনুকূলে ফুসলানো হয়েছে। একটি অংশ এরূপ :

> মনিব পত্নীর আজও সেই ব্রজবাসীর (এই বৈষ্ণব যিনি বৃন্দাবনে থাকেন — ইহা নাম নহে) কথা মনে হয়, তাদৃশ সদানন্দময় মানুষ কমই চোখে পড়ে, ইনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন, পূজার দালানে থামের নিম্নে বসিয়া যাঁহাকে তিলক সেবা করিতে তিনি দেখিয়াছেন, মুখে অহরহ কৃষ্ণ নাম; ইনি বলিয়াছিলেন, — ওহো তাহা নয়, খাঁচার পাখীতে মন আরোপ কর, মন আরোপের জন্যই পাখী পোষা — এই মরদেহ খাঁচা ঐ পাখী আত্মা ... এ জানাই ঠিক জানা ... ! এই ভাব লও! (কমলকুমার, ২০০২ : ৩২৫)

এই অংশের শব্দব্যবহারে যে স্বাভাবিক ইতিবাচকতা আছে, তাতেই বোঝা যায়, ওই সাধুর উচ্চারণে লেখকের সায় আছে। আরো নানাভাবে এ কাজটি লেখক করেছেন। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কমলকুমারের বর্ণনাভঙ্গির গড়ন সম্পর্কে প্রাথমিক আলাপ সেরে নেয়া যাক।

এ বর্ণনার দুরূহতার প্রথম কারণ বাংলাভাষী পাঠক অভ্যস্ত নয় এমন কিছু ভঙ্গির বহুল ব্যবহার। কমলকুমার আপাতদৃষ্টিতে সাধু গদ্যে লেখেন, কিন্তু ব্যবহার করেন ক্রিয়াপদের অচলিত নানারূপ, যেমন নামধাতুর ক্রিয়াপদ ('নেহারিয়াছে'); তৎসম শব্দ, শব্দের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ (বিশেষণের স্ত্রীলিঙ্গরূপ, পুরনো বানান ইত্যাদি), যৌগিক শব্দ ইত্যাদিতে দুর্মর আসক্তি দেখান, কিন্তু প্রায়শই কিছু শব্দ গরহাজির রেখে দেন; প্রায়শই ব্যবহার করেন 'গ্রাম্য' শব্দ, চলিত বাংলায় অচলিত হওয়ার কারণে তাতে অপরিচয়ের মাত্রা আরো বাড়ে; আমাদের অতি পরিচিত বিভক্তি বা অন্যবিধ প্রত্যয় বাদ দিয়ে যান, কিন্তু অনবরত যোগ করেন আপাত-অপ্রয়োজনীয় 'হয়' ক্রিয়াপদ; অনবরত লঙ্ঘন করেন পদক্রম ('বিলি কঠিন দৃষ্টিতে ঐ প্রতীয়মানতা লক্ষ্য বিতৃষ্ণায় করিল', এখানে 'বিতৃষ্ণায়' স্থান পরিবর্তন করায় বাক্যটি অচেনা মনে হয়।); 'তে' বিভক্তির জায়গায় লেখেন 'য়ে' ('প্রবণতাতে' স্থলে 'প্রবণতায়ে'); বিরামচিহ্নের প্রচলিত ধারা না মেনেই অনবরত ব্যবহার করেন তাৎপর্যবাচক প্রসারণশব্দ ('নিরীহতা মধ্যে, উদ্ঘাটিত তদ্দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল;')।

তাঁর গদ্যের বিশিষ্টতার দ্বিতীয় কারণ নানা ধরনের বিপর্যয় — ইন্দ্রিয়ের, স্থান-কালের, অনুভূতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার। একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

> এখন, সম্মুখে কোন কিছু কম্পনে অনুভবের পূর্ব্বেই যে ঝাঁটার জলদি শব্দ কিন্তু তাহারে আকৃষ্ট করে, এখন দেশীয় ঘৃত মিশ্রিত মুরগীর মাংস পাকের গন্ধ তাহাকে প্রলুব্ধ করে নাই; যে অন্যবিধ গন্ধ হইতে ঘৃতগন্ধ যে স্বাদু তা বুঝে ইদানীং! ঝাঁটার আওয়াজে সে আর এক হইল; ফলে ত্বরিতে উহা অনুসরণ প্রাবল্যে অচিরাৎ কালান্তক গোখুরা সর্পের হিস্ সুঘরাইএর জিহ্বায় ঘটিল, আর সে তখনই পরমাশ্চর্য্য ভালবাসাতে ঐ বিভীষিতকারী করাল হিস্ শব্দে তিতির পাখীটিকে, আতঙ্কগ্রস্ত করিতে বাহাদুর! মহা আহ্লাদে তাহাতে, সে আপন কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত চারিদিকে দেখিল, পরক্ষণেই হিস্ শব্দ খেলিয়া উঠিল, ইহাতে সকালের হাওয়া বজ্রাহত, মানুষের রক্ত নিস্তেজ প্রাপ্ত হইল। (কমলকুমার, ২০০২ : ২৯২)

উদ্ধৃত অংশে আছে একরাশ ছবি। ছবিগুলো অনুভূতির সূক্ষ্মতাকে মান্য করে তৈরি হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ও সক্রিয়, এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় রূপান্তরিত হতে উন্মুখ। এখানে 'আওয়াজ ঘটে', আতঙ্ক তৈরি করা 'বাহাদুরি', শব্দ 'খেলিয়া উঠে', হাওয়া 'বজ্রাহত হয়'। ক্রিয়াপদগুলো অনবরত কাল পরিবর্তন করতে থাকে। বিশেষণ পালন করে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তার মধ্যেই 'ভালবাসা' আর 'বিভীষিকা'র মতো পরস্পরবিরোধী বিশেষণ প্রায় সমার্থে ব্যবহৃত হয়।

এসবের মধ্য দিয়ে আসলে কমলকুমারের বাক্যস্তরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। উপবাক্য আর উল্লেখের জোয়ারে বাক্য আর শেষ হতেই চায় না। উপবাক্যগুলো যে পরস্পরের সাথে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় যুক্ত, এই বোধ তৈরি করতেই হয়ত, প্রায় প্রত্যেক উপবাক্যের আগে 'যে' অব্যয় যুক্ত করেন। সম্ভবত পুরনো আইনের ভাষা থেকে তিনি ধারণাটি নিয়েছেন। 'বাক্যের সমগ্রতা সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন বলেই যতিচিহ্নের মধ্যে কমলকুমার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন বিস্ময়চিহ্ন ও সেমিকোলন' (দেবেশ ১৯৮৪ : ৫৭)। সেমিকোলন পরবর্তী অনুষঙ্গের সাথে পূর্ববর্তীটির আবশ্যিক সম্পর্ক দেখায়; আর বিস্ময়চিহ্ন অনবরত মনে করিয়ে দেয়, বিবরণে লেখক জোরালোভাবে উপস্থিত — অন্তর্নিহিত চেতনা আর অনুভূতির অনুবাদের কাজটাই তিনি করে যাচ্ছেন। কিন্তু উপবাক্য যোজনায় আরো যাঁরা লম্বা বাক্য লিখতেন, তাঁদের সাথে একবিন্দু যোগ নেই কমলকুমারের। কারণ, তাঁর উপবাক্য বয়ানকে সামনের দিকে নিয়ে যায় না; প্রায়শই এক জায়গায় থিতু রাখে। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই, একটি দৃশ্যের বিস্তারের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চান বহুতল, দেখাতে চান সমগ্রকে। দেখাতে চাওয়ার এই ব্যাপারটি বা প্রক্রিয়াটি চিত্রকলার সাথে সম্পর্কিত, চলচ্চিত্রের সাথে সম্পর্কিত[৭]।

ভাষায় যখন বর্ণনা করা হয় কিছু, তখন বাক্যে বা বাক্যাংশে কোনো দৃশ্য/দৃশ্যাবলি বা ঘটনা/ঘটনাবলির একাংশের বর্ণনা করা হয়। পরে অপরাংশের। কিন্তু দৃশ্য/দৃশ্যাবলি বা ঘটনা/ঘটনাবলি অনেকসময় একই সময়ে একই তলে উপস্থিত বা ঘটমান। চলচ্চিত্রের বর্ণনাধারায় ক্যামেরার বড় ফোকাসে সবটা একসাথে ধরা সম্ভব। পরক্ষণেই আবার বিশেষ দৃশ্য বা দৃশ্যাংশকে ক্লোজশটে বিশিষ্ট করা সম্ভব। একাজটি ভাষিক বর্ণনায়ও করা যেতে পারে। কার্যত বর্ণনা এরকমই হয়। কিন্তু সিনেমার অন্য কিছু তল — সংলাপ, সঙ্গীত

ইত্যাদি — একইসাথে অন্য কাজও করে যায়। ফলে ছবিটি অনেক পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। বর্ণনা বহুতলীয় বা বহুমাত্রিক হওয়ার সুযোগ অনেক বাড়ে। কমলকুমার চেয়েছেন, সিনেমার যা স্বভাবজ, ভাষিক বয়ানে তাকে সম্ভবপর করতে। একইসাথে তিনি ভাষিক বয়ানে বিশেষভাবে সম্ভবপর — সিনেমার চিত্রায়ণে দুষ্কর — এমন উপাদান বা দিকগুলোকেও বাদ দিতে চাননি। যেমন, বহির্বর্ণনা বা বহিঃক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে অন্তরের ভাবনা যুক্ত করা। মানবমনের যে কোনো দশায় অতীত-ভবিষ্যতের অসংখ্য তল কাজ করতে থাকে, যা বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহে বিশেষ মূর্তিতে জায়মান হয়। এই সমন্বিত মূর্তি প্রণয়ন সিনেমার ভাষায় কঠিন, সাহিত্যের ভাষায় তা সহজাত। কমলকুমার এ বস্তুও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে চান। ফলে তাঁর বয়ান একইসাথে বিশদ আর জটিল হয়ে ওঠে।

জটিলতার আরেক কারণ পরবর্তী ঘটনার বরাত আগেই ব্যবহার করা। কমলকুমার সবসময়ই কাজটি করে থাকেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি বর্ণনাংশেই আগের-পরের অসংখ্য অনুষঙ্গ সূত্রাকারে ব্যবহৃত হয়। কথাসাহিত্যে এ বস্তু মোটেই বিরল নয়। কিন্তু কমলকুমারের লেখায় এ বস্তু এত বেশি আর এত বিচিত্র যে, দেবেশ রায় ঠিকই বলেছেন[৮], তাঁর লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি খুঁজে নেওয়া বেশ জটিল হয়ে ওঠে। এর বাইরে তিনি আরেকটি কাজ করেন — কোনো প্রসঙ্গে একটি সংজ্ঞা তৈরি করে নেন এবং বর্ণনাধারায় তা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রেই আগাম ব্যবহার করেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। রিখিয়ায় সাঁওতাল-নৃত্য চলছিল। 'প্রধানা শিক্ষয়িত্রী' এই নাচের ধরন-ধারণে অস্বস্তিকর নানা উপাদান দেখে ক্রমশ পাপের অনুভূতিতে আক্রান্ত হন। কিন্তু নাচ বন্ধ করার উপায় ছিল না। কমলকুমার লিখছেন : 'এ নৃত্য সদ্য অঙ্কুরিত আম্রবীজ নহে যে স্বহস্তে উপড়াইয়া ফেলিবেন' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩২২)। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য এই উপমার আয়োজন। কিন্তু 'সদ্য অঙ্কুরিত আম্রবীজ' কথাটার উৎস কী? কমলকুমার পরের আট/দশ অনুচ্ছেদ জুড়ে উপমানটির জন্ম-উৎস ব্যাখ্যা করেন। তাতে আমের আঁটির অঙ্কুরিত হওয়ার মধ্যে যৌনতার অনিঃশেষ উৎস আবিষ্কারকারী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ মুলতুবি রেখে বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায়, অনুষঙ্গ-সূত্রে প্রসঙ্গের আমূল পরিবর্তনের কারণেই কমলকুমারের লেখা অতিরিক্ত অভিনিবেশ দাবি করে। আর পরের অনুষঙ্গের আগাম ব্যবহার দাবি করে, কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস আবশ্যিকভাবে দ্বিতীয়বার পড়তে হয়[৯]।

উপরে কমলকুমারের ভাষা-ভঙ্গি সম্পর্কে যা বলা হল, তা বহিরঙ্গ মাত্র। অন্তরঙ্গের খোঁজ নেয়ার জন্য নজর দিতে হবে বয়ানের তাৎপর্যের দিকে। কিংবা বলা ভালো, ভাষা ও ভঙ্গির বিশিষ্টতাই তাঁর রচনায় যুগপৎ বয়ানের আর তাৎপর্যের বিশিষ্টতা তৈরি করে।

৩

সুঘরাই যে ডোম এবং অচ্ছুত, এ তথ্য *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* উপন্যাসটি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি। ভুলে না যাওয়ার এক কারণ, যেমনটা আগেই বলা হয়েছে, বাস্তব ও বস্তুসত্য এ উপন্যাসে পরম মূল্য পেয়েছে। আর উপন্যাসটির প্রধান ও প্রায় একমাত্র চরিত্র

সুঘরাইয়ের জন্য এরচেয়ে গভীর বাস্তব আর কী হতে পারে যে, সে পাপ ও পুণ্যের ধারণা থেকেও বঞ্চিত। উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি প্রান্তে সুঘরাইকে এই বাস্তবতার মধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মানে, তার আর দশটি আবেগ-অনুভূতি বা ভাবনা-বোধি কখনোই অস্পৃশ্যতার বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে চিত্রায়িত হয়নি। এটাই হয়েছে প্রধান নির্ণায়ক[১০]।

এ উপন্যাসে চিত্রিত ডোম-বাস্তবতাকে অবশ্য বস্তুসত্যের দিক থেকে সামান্যই বোঝা যাবে। যে গভীর অনুভূতি আর অভিজ্ঞতাজাত সহানুভূতি মিশিয়ে লেখক বর্ণবিভাজিত সমাজের বর্ণহীন অংশটিকে চিত্রিত করেছেন, তার তুলনা বিরল। এ অভিজ্ঞতা কেবল এই স্তরের নয় যে, লেখক 'এক পাতা চিঁড়া দধি দেখিলে, যে আমোদ সেই আমোদ হইল' বা 'ক্রমে সে এতেক গর্ব্বিত যেমন যে, তাহার বসিয়া খাইবার পুঁজি আছে' ধরনের বাস্তবলিপ্ত দৃষ্টান্তে নিজের বর্ণনা সাজাতে পারেন; বরং অস্পৃশ্য হওয়ার অনুভূতির সাথে একাত্ম হওয়ার আন্তরিক কুশলতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই একাত্ম হওয়ার সম্ভবত সর্বোত্তম উদাহরণ সুঘরাইয়ের উল্লাস-উদ্দামতা আর সুখানুভূতি প্রকাশের সেই ভাষ্যগুলো, যেগুলো তৈরি হয়েছে লেখকের মধ্যস্থতায় :

> ও যে অবিচারিত চিত্তে অসাধনেই ডোমবুদ্ধিতে বলিয়াছিল, — ওরে পক্ষী, এখন আমি নিজেই ঐ যে দুইটি পাহাড় স্পর্দ্ধাভরে একে অন্যের প্রতি চাহিয়া আছে সেই দুইটিই আমি, এখন আমি ত্রিকূট, এখন আমি ডিগরিয়া পাহাড়, এবার ইতোমধ্যে যে দিক সকল, যে রহস্য ব্যাপ্ত, তাহা কব্জা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাহা গ্রহণ কর গ্রহণ কর, খাও আমি সুখী সার্থক ও ধন্য হই।
>
> পরক্ষণেই বলিল, আয় আমরা কামড়াকামড়ি করি, কুকুররা যেরূপ করে! আমার ভগনীপতি ও তাহার স্ত্রীলোক যেরূপ করে। (কমলকুমার, ২০০২ : ২৯২)

উল্লাসের-উদযাপনের বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভাষ্য কমলকুমার লেখক-ভাষ্যেই তৈরি করেন — তাঁর ভাষাভঙ্গির এই যে বৈশিষ্ট্যের কথা এর আগে বলা হয়েছে, উল্লিখিত অংশ তার ভালো নমুনা। অনুভূতির ধরনের দিক থেকে তা খুবই 'মানবিক', যদিও নিম্নবর্গীয় ডোম বালকটির সত্তা তাতে একবিন্দুও উপেক্ষিত হয়নি।

অস্পৃশ্যতার সংকটের এরূপ নিখুঁত, সর্বলিপ্ত আর আন্তরিক আয়োজন থেকে এমন বিভ্রম জাগতেই পারে, কমলকুমার মজুমদার ডোমবালক সুঘরাইয়ের মুক্তির আখ্যান রচনা করেছেন। রফিক কায়সার (২০১১ : ১-১৩; ৪৩-৬১) উপন্যাসটিকে এভাবেই পাঠ করেছেন। এ পাঠ শুধু অতি আংশিক নয়, সামগ্রিকতার বিচারে বিভ্রান্তিকরও বটে। উপন্যাসের শেষাংশে খাঁচার সজ্জা আর পাখির মৃত্যু সুঘরাইয়ের মুক্তির কোনো ইঙ্গিত দেয় না। তাছাড়া সুঘরাইয়ের বৈদ্যনাথধামে চর্কির মতো ঘোরাঘুরি, বাবু-বিবি বৃত্তান্ত বা অন্য আরো নানা আয়োজন এ পাঠে অর্থহীন বাচালতায় পর্যবসিত হয়[১১]। তাহলে সুঘরাই কি ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে তার শ্রেণি-গোষ্ঠী-বর্ণের প্রতিনিধি? শোয়াইব জিবরান (২০০৯) সেরকমই ভেবেছেন। লিখেছেন : '... পাখির মৃত্যুর প্রতীকী ঘটনার ভেতর দিয়ে কমলকুমার আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় আধুনিকতার বিষে আদিম কৌম সংস্কৃতির মৃত্যুর করুণ গাথাকে উপন্যাসে শিল্পরূপ দান করেছেন' (শোয়াইব, ২০০৯ : ১৪৭)। এই বিবৃতিতে, সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার নিমিত্তে, সুঘরাইয়ের সীমা যথেষ্ট বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে —

শুধু তার সম্প্রদায় পর্যন্ত নয়, কৌমসমাজের সাধারণ প্রতিনিধিত্ব পর্যন্ত; যেনবা শুধু বালক সুঘরাইয়ের গল্প যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে না। এই পাঠের সংকট দুটো : এক. উপন্যাসে এমন চিহ্ন নেই বললেই চলে, যা সুঘরাইকে সমষ্টির প্রতিনিধি হিসাবে পড়তে উৎসাহিত করে। সত্য বটে, সাহিত্য-শিল্পে সাধারণীকরণ ঘটে, বা সাধারণীকরণের মধ্য দিয়েই টেক্সটের পাঠ বৈধতা পায়। এ উপন্যাসেও তা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে ওঠার জন্য লেখকের দিক থেকে যে এনতেজাম থাকতেই হয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়* (১৩৫৪) যেমন জীবনযাপনের সামগ্রিকতার দিক থেকে কৌমসমাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সুঘরাইয়ের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। অস্পৃশ্যতার সমস্যা কৌমসমাজের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা নয়। দুই. কৌমসমাজের চিত্র বা এ ধরনের 'সংস্কৃতির মৃত্যুর করুণ গাঁথা' উৎপাদনসম্পর্কের পর্যাপ্ত জোগান ছাড়া অসম্ভব। শোয়াইব জিবরানের উক্ত সিদ্ধান্ত আসলে রফিক কায়সারের অভিযোগটিকে *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* উপন্যাসের জন্য অনিবার্য করে তোলে যে, কমলকুমার উৎপাদনসম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাব ছাড়াই কেবল সহানুভূতির কবজেই ভারতবর্ষীয় অস্পৃশ্যতার সংকটের সুরাহা করতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লেখিত দুটি পাঠের ক্ষেত্রেই কমলকুমারের বর্ণনাভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য প্রতারক-ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে হয়। পর্যাপ্ত নামশব্দ আর উপকরণবাচক শব্দ এবং চরিত্র ও বিষয়ানুগ উচ্চারণভঙ্গি এই টেক্সটে এক ঘোরতর 'বাস্তবলিপ্ততা'র বোধ তৈরি করে। ফলে বুঝে ওঠা মুশকিল হয় যে, এই বাস্তব আমাদের চেনাজানা বাস্তবের সমান্তরাল কোনো নির্মাণ নয়। এ 'অন্য তলের বাস্তব'। মার্কেজের *হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিসিউড* অন্য তলের বাস্তবই বটে; কিন্তু ভঙ্গির ভিন্নতার কারণে তা প্রথম থেকেই শনাক্ত করা যায়। চেনা বাস্তবের সাথে অব্যবহিত যোগ সাব্যস্ত করে পড়তে হয় না। কমলকুমার মজুমদার অব্যবহিত বাস্তবের প্রতিরূপ হিসাবে পাঠের প্ররোচনা দেন, কিন্তু তৈরি করেন অন্যতর বাস্তব। ওই দুটি পাঠেই *পিঞ্জরে বসিয়া শুক*কে যথেষ্ট এলানো টেক্সট হিসাবে পড়া হয়েছে, যেনবা এর কিছু অংশ বাদ দিয়েই পৌঁছা যাবে 'মূল পাঠে'। কিন্তু যতটা ভাবা যায়, এ উপন্যাস তার চেয়েও বেশি একক গড়নের — সুছাঁদ অথচ অচেনা অবয়বের।

বরং 'ডোম' বা 'অস্পৃশ্যতা' বিষয়টিকে অন্যভাবে পড়ার কিছু ইশারা উপন্যাসের নানা জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো দেখা যায়। যেমন, বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে 'মনিব-পত্নী ঐ ডোম বালকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন' (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮৪)। আরেকবার (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮২) নগর-পরিভ্রমণের কালে 'পাখী শব্দে' সুঘরাই 'নাড়ীর যোগসূত্র' প্রাপ্ত হলে 'তাহার ডোমত্ব' ঘুচে যায়; পরক্ষণেই পাখির স্মরণে বুকে চাপড় মারলেই 'তাহার ডোমত্ব নিশ্চিহ্ন হইল'। এরপর সে নতুন দৃষ্টিতে চারপাশ দেখতে থাকে। মনিববাড়িতে সুঘরাইকে 'ডোম' সম্বোধন নিষিদ্ধ ছিল। তার মানসিক পরিবর্তনের নানা পর্বকে 'ডোমত্বে'র সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। এসব থেকে মনে হয়, বাস্তব প্রয়োগ অক্ষুণ্ন রেখেই 'ডোম', 'ডোমত্ব' বা 'অস্পৃশ্যতা'কে বিশেষ ধারণা হিসাবে পাঠ করা সম্ভব। হয়ত ধারণাটি নিজেই একটা রূপক।

৪

নগরের ছবি কমলকুমারের রচনায় তুলনামূলকভাবে কম। কম আসলে গ্রামের ছবিও। যে অর্থে বাস্তব নগর আর গ্রামের ছবি সাহিত্যকর্মে আঁকা হয়, কমলকুমারের প্রায় কোনো উপন্যাসের বাস্তবই সে ঘরানার নয়। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয় গঙ্গাতীরে, স্যানাটোরিয়মে, ভেড়িবাঁধে। *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক উপন্যাসের পটভূমিও কোনো স্বাভাবিক-সাধারণ লোকালয় নয় — জঙ্গলাকীর্ণ সাঁওতাল-বসতি, আর 'চেঞ্জার'দের সাময়িক আবাস। কিন্তু উপন্যাসটিতে সাঁওতাল-বসতিরও কোনো ছবি নাই, চেঞ্জারদের প্রাত্যহিক জীবনেরও বর্ণনা নাই। আছে এক শহরের ছবি, যে শহর পূজা ও মেলার অনিত্য সমাগমে জমজমাট। আছে বারান্দায়, চাতালে বা পাহাড়ি পথে সঞ্চরণশীল মানুষের কথকতা, আর সাঁওতাল নৃত্যের আনুষ্ঠানিকতায় ততোধিক আনুষ্ঠানিক কথামালা। চেঞ্জারদের এই সমাগমে নগরের ছবি তৈরি হয়নি, কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বেশ বিস্তৃত আলোচনা আছে। সে আলোচনা স্পষ্টতই নেতিবাচক এবং ব্যঙ্গাত্মক।

১৯৩৫ সালে[১২] রিখিয়ায় সমবেত এই নাগরিক ভদ্রমণ্ডলির মধ্যে গণ্যমান্য নারী-পুরুষ ছিলেন। ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, স্বদেশী আন্দোলন বা গান্ধীবাদী আন্দোলন করা অভিজাত মানুষ। তরুণ-তরুণী বা শিশুরাও ছিল। কেবল সুঘরাইয়ের মনিব-দম্পতি বাদে এদের আর কারো জন্য লেখক সামান্যতম সহানুভূতিও বরাদ্দ করেন নাই। এমনকি ফ্যাশনদুরস্ত তরুণী বিলির জন্যও নয়। বরং বিলির প্রেমকাহিনিতে লেখক তুলে ধরেন বীভৎসতা। তার আরোগ্য কামনা করেন। তাঁর কামনার ভাষাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :

> ওগো পুণ্য নগরী কলিকাতা! গঙ্গা বিধৌত শ্রীশ্রীকালীমাতা আশ্রিত, ভগবান রামকৃষ্ণ পদ-ছোঁওয়া তুমি, ধন্য নগরী কলিকাতা! উচ্চবর্ণের অভিজাতবর্গের কলিকাতা। বিলিকে দয়া করিও, আর যে প্রকৃতিরে অনুনয় করিও, সে যেন বিলির প্রতি দয়া রাখে। (কমলকুমার, ২০০২ : ৩১৬)

এখানে কলকাতাকে যেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে, সেগুলো নেতিবাচক নয়। এমনকি 'উচ্চবর্ণের অভিজাতবর্গের কলিকাতা' অংশও নয়। জন্ম-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো আভিজাত্যই কমলকুমারের কাছে যে মূল্যবান ছিল, এই উপন্যাসে এবং অন্যত্র তার বিস্তর প্রমাণ আছে[১৩]। মোদ্দা কথা, রিখিয়ার নাগরিক সম্প্রদায়ের জন্য কমলকুমারের বরাদ্দ করা সর্বজনীন ব্যঙ্গ কলকাতা বা নগরজীবনের সাধারণ চিত্র নয়। এই ব্যঙ্গকে বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক' বা 'আধুনিকতাবাদী' নগরচিত্রণের ধারায় ফেলা যাবে না। তাছাড়া যে নগরে সুঘরাই হারিয়ে যায়, তাকে আকারে-আয়তনে বেশ বড় পরিসর বলেই মনে হয়। এই নগরচিত্রের রূপকী-প্রতীকী সম্ভাবনাকে আপাতত বাদ রেখে বলা যাক, ওই নগরে 'ভালো' অনেক কিছুই ছিল।

এখানে কমলকুমারের ভাষামানস আর অতি-নতুন প্রয়োগবিধি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা দরকার। *খেলার প্রতিভা* উপন্যাসের শুরুতে লেখক বলেছেন, তিনি ঘটে যাওয়া ঘটনা 'নির্ম্মাণ' করবেন। কিভাবে? 'আমাদের বোধিত হওনের যেমন ধারা, যেমন

প্রকৃতি, যেমন উপাদান, যেমন ভিৎ তাহা এইটিতে উল্লেখিত থাকিবেক; যে আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩৪৫)। অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'আমরা খুব গ্রাম্য; পাশ্চাত্য আমাকে মা বলিতে শিখায় নাই' (কমলকুমার, ২০০৯ : ২৬১)। এ ধরনের আরো নানা উল্লেখে 'সরল', 'গ্রাম্য' প্রভৃতি উচ্চারণকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করলে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, তিনি সাধারণ মানুষদের ভাষায় সাধারণের কাহিনি বর্ণনা করবেন। এ অর্থে তাঁর প্রস্তাবের সাথে বাস্তবের যোগ না পেয়ে বহু পাঠকই বিচলিত হয়েছেন (নবনীতা ১৯৯৩, রফিক ২০১১)। অলোক সরকার এ সমস্যার অলোকসামান্য সুরাহা করেছেন :

> যে মানুষদের তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন মনে রাখতে হবে তারা 'অতীব সরল', 'অতীব গ্রাম্য'। এই সরল মানুষেরাই তার ভাবনার বিষয়, সাধারণ মানুষেরা নয়। সাধারণ মানুষ ওপর থেকে পাওয়া সংস্কার এবং সংস্কৃতির ফসল, তাদের সাজপোশাক বানানো, ভাবভঙ্গী বানানো, এমনকি রাগ-অনুরাগ স্বপ্নও বানানো। সাধারণ মানুষ সার্বিক মানুষ। ... কিন্তু মানুষ যেখানে সরল, যেখানে সে প্রকৃতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তার 'বোধিত হওনের ধারা' অকলুষিত, তার উপাদান এবং ভিত অর্থাৎ পটভূমি বা ঐতিহ্য অনাবরণ সেখানে সাকল্যিক উপকরণে তাকে 'বিস্তার' করা কঠিন কাজ। (অলোক, ১৯৯৩ : ৪০-৪১)

কমলকুমার মজুমদার সে নিষ্ফল চেষ্টা করেননি। তৈরি করেছেন নতুন ভাষা। সে ভাষার প্রধান অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একরাশ নতুন সংজ্ঞা তৈরি করে তার মুখোমুখি হওয়া। নতুন সংজ্ঞার আলোকে নতুন বয়ান 'নির্মাণ'। এই নতুন সংজ্ঞাকে পাঠকের চেনাজানা সংজ্ঞার নিরিখে পাঠ করাই কমলকুমার পাঠের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি[১৪]। জটিলতারও প্রধান উৎস। আদতে সচেতনভাবেই তিনি বয়ানের ধারার মধ্যেই অনবরত তৈরি করে নেন নতুন সংজ্ঞা। *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* উপন্যাসে খোদ 'সংজ্ঞা' শব্দটির ব্যবহার এত বেশি এবং এত বিশিষ্ট যে, নিছক গোয়ার্তুমি ছাড়া একে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। যেমন, এক ফাঁকে লেখক তৈরি করে নেন তাঁর বয়ানের জন্য অতি জরুরি 'সরলতা'র সংজ্ঞা :

> সুঘরাই এই গীতে ডোমসুলভ চোখে, বালক-উচিত ভ্রূভঙ্গীতে গায়কদের মুখপানে চাহিয়া থাকে, ইহা অলোকসামান্য কাব্য, কাব্যত্ব ইহা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা বশত সরলতায়ে নহে, তবু সে অন্যমনে দেখে। সরলতা যাহা ভক্তির বীজ, অবশ্য কোনো শিশুরই সরলতা নাই, তাহার অপরিণত স্বভাব আছে, সরলতা সন্ন্যাসধর্ম্মের, সরলতা সন্ন্যাসীর, অবতারাদির ভাবই সরলতা ... (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮৯)

এ উপন্যাসে লেখকের কাঙ্ক্ষিত সংজ্ঞার্থ উন্মোচনের প্রধান চাবি রিখিয়ার নাগরিক সমাজের বর্ণনা।

রিখিয়ার অভ্যাগত নাগরিক সমাজের চিত্র প্রথানুগ নগরচিত্র নয়। কমলকুমার মজুমদারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। সে দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে শহরবাসী-সম্পর্কিত হলেও সামান্যে তা মানুষ-সম্পর্কিত ভাবনাই বটে। একাট্টা নেতিবাচকতার কারণে এই পরিচয়লিপিতে কমলকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। এ কারণে এ অংশই লেখকের উপলব্ধি অনুমানের সবচেয়ে ভালো ক্ষেত্র।

কী তাদের পরিচয়? তারা অতিরিক্ত বিলাসী এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে কৃত্রিম। আরোপিত শিক্ষার চাপে তারা সহজ-স্বাভাবিক বোধ হারিয়েছে। সে এমনই মর্মান্তিক যে শিশুকে মায়ের স্তন্যদানও তাদের কাছে লুকোছাপার ব্যাপার মনে হয়। সাঁওতাল নৃত্যের 'গ্রাম্য সারল্য' উপভোগের চোখ তারা হারিয়েছে। যেমন হারিয়েছে সুঘরাই আর তার পাখিটির সাথে সম্পর্কিত হতে পারার ক্ষমতা। তারা 'শিক্ষা'র নানামাত্রিক বিধ্বংসী ক্ষমতার অসহায় শিকার। পরিহাসপটু লেখক এ গোত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নেন 'প্রধানা শিক্ষয়িত্রী'কে, আরোপিত 'শিক্ষা'র দাপটে যে শুধু নিজেই নিজেকে হারায়নি, ভবিষ্যৎ নগরবাসীদের মধ্যেও সে অসংযুক্তির পারঙ্গমতা তৈরি করছে। লেখক এই অসংযুক্তিকেই সমবেত নাগরিক সমাজের প্রধান গলতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের প্রকল্প নিয়ে বা হাওয়া বদল করতে তারা রিখিয়ায় আসে বটে, কিন্তু পাহাড়-অরণ্য-প্রকৃতির 'স্বাভাবিক' সৌন্দর্য আবিষ্কারের চোখ তাদের নেই। প্রাকৃত মানুষদের সাথে কোনো প্রকৃত সংযোগ তো দূরের কথা।

নাগরিক মানুষদের এই বিশিষ্ট পরিচয় নির্মিত হওয়ার পর এদের 'অপর' সম্পর্কে আমরা আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারেই গ্রাম, গ্রামীণ জীবন, আদিবাসী সারল্য বা পাহাড়ি প্রকৃতির অকৃত্রিমতার দিকে তাকাই। এসব উপাদান উপন্যাসে যথেষ্ট আছে। কিন্তু খানিকটা অস্বস্তিকরভাবে আমরা আবিষ্কার করতে থাকি, পুরো উপন্যাসজুড়ে এই শিক্ষাগ্রস্ত মানুষদের বিপরীতে লেখক গড়ে তুলছেন শিক্ষিত নাগরিকদেরই একটা অংশকে — মনিব ও মনিবপত্নীকে। এই দুই চরিত্র উপন্যাসে এতই ইতিবাচক আর পূর্বোক্ত নাগরিক জনগোষ্ঠীর এতটাই বিপরীতক্রমে বিন্যস্ত যে, কোনো ভুল হওয়ার কথা নয়। তবু ভুল হয়। কারণ আমাদের অভ্যস্ত ভাষায় এরা বিপরীত ক্যাটাগরি বা বর্গে পড়ে না। লেখক এর মধ্যেও নতুন বিপর্যয় সাধন করেন। 'প্রধানা শিক্ষয়িত্রী'র চোখে মনিবপত্নীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এরূপে : 'যিনি ধর্মপ্রাণ, ... ইঁহার ভাষা কুশ্রী — অথচ চালচলনে ভীষণ ইংরাজ — যেহেতু ইনি ভূতপূজক হিন্দু; জন্মান্তরবিশ্বাসী ও গঙ্গা-সমর্পিত মন, ...' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩০৭-০৮)। এই বর্ণনার 'চালচলনে ভীষণ ইংরাজ' কথাটি আমাদের অভ্যস্ততা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভীষণভাবে চাপে ফেলে দেয়। বোঝা যায়, 'স্বদেশী', 'জাতীয়তাবাদী' প্রভৃতি উল্লেখ আবশ্যিকভাবে ইতিবাচক নয়। এসব সংজ্ঞায় চিহ্নিত ব্যক্তির মধ্যে ওই বৈশিষ্ট্য নাও থাকতে পারে, যা লেখকের মনোনীত চরিত্র মনিব ও মনিবপত্নীর আছে।

সুঘরাই ও তার পাখিকে রিখিয়ার আদিবাসী সমাজ, পাহাড় ও প্রকৃতির সাথে বারবার একাকার করেই দেখানো হয়েছে। এটাই নাগরিকতা বা আধুনিকতার বিপরীতে সুঘরাইকে পাঠ করতে চাওয়ার প্রধান ফাঁদ। কিন্তু নাগরিকসমাজের দুই অংশের মধ্যেই সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত 'বাইনারি অপোজিশন' নির্মিত হয়ে যাওয়ায়, বিপরীত ছাঁচে পড়ার চাপ থেকে সুঘরাই মুক্ত হয়ে যায়। সে বালক, সে আদিবাসী অকৃত্রিমতার প্রত্যক্ষ মূর্তি, সে প্রাথমিকভাবে বিচ্ছিন্নতার সংকটমুক্ত ভূমিপুত্র, সে সরল। সেক্ষেত্রে সুঘরাই তার পাখিসহ পঠিত হতে পারে ওই দুই পক্ষের 'সাবজেক্ট' আকারে। তার সাথে সংযুক্ত হতে পারা বা সংযুক্তির ধরন খোদ কর্তাকেই চিনিয়ে দেবে। আর পাখি ও খাঁচাসহ সুঘরাই যে রূপক-

আখ্যানের মধ্য দিয়ে গেছে, তা মানব-অস্তিত্বের স্বতন্ত্র নিরীক্ষা হিসাবেই পাঠ্য। উক্ত দুই পক্ষের কোনোটিরই বিপরীতক্রমে নয়, বরং যাবতীয় বিবেচনার সারসত্য/মাপকাঠি রূপে।

৫

'... কমলবাবুই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি বিশ শতকের আধুনিকতাকে জেরা করেছেন। আদিমতা এবং এক প্রাচীন সভ্যতার সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাকে' — রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কমলকুমার, ২০০৯ : তেইশ) এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতক নয়, বিশ শতক। সাধারণভাবে বিদেশি শাসন, উপনিবেশ, নাগরিকতা বা আধুনিকতা সম্পর্কে পূর্ব-নির্ধারিত বিদ্বেষ নাই তাঁর। কিন্তু গভীরতর উপনিবেশায়ন-প্রক্রিয়ায় যে বিচ্ছিন্নতা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয়ে উঠল, যা কিছু 'সরল আর স্বাভাবিক' তাতে সংযুক্ত হতে পারার ব্যর্থতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, তার পর্যালোচনা কমলকুমার জরুরি মনে করলেন। এই সংযুক্তি মানুষের আপন স্বভাবের সঙ্গে সংযুক্তি। স্বভাবটা বিশেষভাবে দেশ-কাল-ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। মানববৃত্তি আর সত্তার বলিষ্ঠ বিকাশ, তাঁর মতে, এই সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব হয় না। এই বিশেষ অর্থেই কমলকুমার 'বাঙালি' বা 'বাঙালি হিন্দু' কথাটা ব্যবহার করেন[১৫]। উনিশ শতকে উপনিবেশায়নের প্রচণ্ডতার মধ্যেও পুরনো ভাবের রেশ পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি, কিন্তু ক্ষয় চলছিল। আর পুনর্গঠনের মধ্যে কিছু গভীর পরিবর্তন ঘটে যায়। কমলকুমার 'ভাব প্রকাশ বিষয়ে' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর ও অন্যদের চর্চা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ... সবই বেদান্তের স্তুতি, কেমনে উপলব্ধির তাহা নাই, শুধু শব্দ আছে, ফলে আমরা কিছু উন্নীত হই নাই; আরও স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে মুক্তি-আন্দোলনের ফেরে 'মুক্তি' শব্দটা আধ্যাত্মিক হইতে জাগতিক হইল, আমরা ক্রমাগত বাঙালীত্ব ছাড়িয়া ভারতীয় হইতেছি শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে নিন্দা করেন, দ্বিজেন ঠাকুর মহাশয় যারপরনাই যাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ... এই মুক্তি-আন্দোলন ও বিশেষত ব্রাহ্মধর্ম্মস্রোতে আমরা উপনিষদ হাতড়াইলাম — আমাদের সাধনার ধারা ভুলিয়াছি। বাঙলাকে (ইডিয়ম!) উহা ঈশ্বর গুপ্ত, দাসু রায় ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না; ও দার্শনিক তত্ত্ব জড়ভাবে আমরা অনেকদিন লাভ করি। তখন আমাদের বিষয় বাস্তবতা পৌরাণিক চরিত্র — কখনও তাহারে মানুষ বৃত্তি দিয়াছি — কখনও উহাকে আদর্শায়িত করা হইয়াছে। (কমলকুমার, ২০০৯ : ২৬২-৬৩)

এর মধ্য দিয়ে জীবনযাপন আর ভাবনাপদ্ধতির যে রূপ নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, *পিঞ্জরে বসিয়া শুক* উপন্যাসে তারই কোলাজচিত্র রচিত হয়েছে। সে চিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'প্রধানা শিক্ষয়িত্রী' আর তার স্বামী দাশ মহাশয়। এরা সব ধরনের সহজ ভাব থেকে বঞ্চিত। নিজেদের ছকের বাইরের কোনো কিছুতে সংযুক্ত হতে ব্যর্থ — সে সাঁওতাল নৃত্যই হোক আর পাখিসহ সুঘরাই হোক, অপ্রমিত ভাষার মনিবপত্নীই হোক আর আবেগপ্রবণ সরসীবাবুই হোক। কারণ কী? কমলকুমার এদের যেসব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে দুইপ্রস্ত প্রধান। এক. 'তাঁহারা তাই গিরিডি যাইবেন, সেখানে নিজেদের ব্রাহ্মগোষ্ঠী আছে, একটি সমাজমন্দির আছে! প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ ছাড়া প্রাচীনতা সাবেকত্ব উপরন্তু নাই' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩০৭)। দুই. 'তাঁহাদের জীবনধারা এক

সূক্ষ্ম সমালোচনা হইতে উদ্ভূত, সমালোচনা তাঁহার অবলম্বন, ... কুসংস্কার তাঁহার নাই;' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩১৮)। দেখা যাচ্ছে, একটি বিশেষ আরোপিত শিক্ষা ও জীবনবোধের ধারা আর যুক্তি-তর্কময় উপলব্ধি-প্রক্রিয়াই তাদের বিচ্যুতির কারণ।

এর বিপরীতে কমলকুমার প্রস্তাব করেন ভক্তি। কেবল ভক্তিরসেই জাগতে পারে বিচ্ছিন্নতাজনিত অস্বস্তি, কেবল ভক্তিতেই মিলতে পারে সংযুক্তির স্বভাব ও ক্ষমতা। মনিব ও মনিবপত্নী যে সুঘরাইয়ের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, তার কারণ তো যুক্তি নয়, ভক্তির উপলব্ধি:

> তাহাকে একান্তে খাইতে দেওয়া হয় — মনিবপত্নী পরিবেশন করেন, সে যখন খাইতেছিল তখন তাহার পাখিটিও তাহার পাতেই খাইতে আছে, এই ছবি গ্রাম্য বালকদের কলরোল, রন্ধনের গন্ধ, পাখী কুকুরের চেঁচামেচি ছাড়াইয়া উঠে — ইহাতে শাস্ত্রের উদাহরণ দেখিয়া মনিব পত্নী তদীয় পতিকে উহা প্রত্যক্ষ করিতে ডাকিলেন। ঠাকুর আঃ তুমি দেখাইলে! তাহাদের সাধন নির্দ্দেশে প্রত্যেকের পাতা ফেলিয়া দিলেন — মনিব পত্নী ঐ ডোম বালকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮৪)

'শাস্ত্রের উদাহরণ' কথাটি আক্ষরিকভাবেও পড়া যেতে পারে। কোনো একটা উছিলা হিসাবেও দেখা সম্ভব। যেভাবেই দেখা হোক, নিশ্চিতভাবেই এই সংযুক্তির পথ 'যুক্তি' নয়। সুঘরাই এবং তার পাখি সম্পর্কে সমবেত 'শিক্ষিতমণ্ডলি'র সাথে মনিব আর মনিবপত্নীর ফারাক বারবার দেখানো হয়েছে। প্রতিবারই মনিব-মনিবপত্নী স্বভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যুক্তির পথ মাড়াননি একবারও; বিপরীত পক্ষের অবলম্বন ছিল যুক্তি, পদ্ধতি ছিল আরোপণমূলক, আর অনিবার্য পরিণতি বিচ্ছেদ। স্মরণীয়, মনিবের পরিচয়ে অনবরত ব্যবহৃত হয়েছে 'বৈষ্ণবীয়' অভিধাটি, আর মনিবপত্নী তার অপ্রমিত ভাষা, দেশাচার এবং ভক্তিপ্রবণতাতেই চিহ্নিত হয়েছেন। বোঝা যায়, 'জয় মাধব, তারা ব্রহ্মময়ী, মাগো — জয় রামকৃষ্ণ' বলে উপন্যাস শুরু করা কমলকুমার মজুমদারের কাছে মোটেই আলঙ্কারিক ব্যাপার ছিল না[১৬]। এ উচ্চারণ উপন্যাসের ভাবলোকের শিরদাঁড়াই বটে।

সুঘরাইয়ের প্রধান পরিচয়, সে এক দেশোয়ালি বালক। দেশোয়ালি এবং বালক। তার আদিমতা আছে, অকৃত্রিমতা আছে। বহিরারোপিত শিক্ষা বা ছাঁচে সে বিপর্যস্ত নয়। খাঁচা আর পাখির রূপকে এই বালকের দেহ-মনকে আলাদা করে দেখবার একটা সুযোগ নিয়েছেন লেখক। দেখিয়েছেন, মনিব আর মনিবপত্নী খাঁচা এবং পাখিসহই সুঘরাইয়ের সাথে সহাবস্থানের নানা কেতা তৈরি করে নিয়েছে। তার ডোমত্ব অস্পৃশ্যতার সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি, যদিও নিম্নগোত্র হওয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। শহর থেকে ফেরার পর তার মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই তার নিজের পূর্বতন স্বভাব থেকে বিচ্যুতি। ভেতরের তুলনায় বাইরের প্রতি বেশি মনোযোগ আর খাঁচার সজ্জার জন্য পাখিটিকে মরে যেতে দেয়া সেই বিচ্যুতিরই ফল। লেখক একে চিহ্নিত করেছেন 'আধুনিকতা' (কমলকুমার, ২০০২ : ৩৪১) হিসাবে। এই চিহ্নায়নের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সম্ভব। কিন্তু এ কথা নিশ্চিন্তে বলা যায়, মনিব-মনিবপত্নীর আকাঙ্ক্ষার সুঘরাই এ নয়। কাঙ্ক্ষিত সুঘরাই অধরাই থেকে গেল।

শহরে বৈদ্যনাথমেলায় পারস্পরিক খোঁজাখুঁজি এ দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে বিস্তৃতি আর আয়োজনে এ খোঁজাখুজি চলেছে, তাতে একে মানবসংসারের সার্বিক আয়োজন বলেই মনে হয়। দুই পক্ষেই এ অন্বেষণ অপূর্ণ থেকে যায়। খোদ অন্বেষণটাই এক প্রকার প্রতীকী তাৎপর্য অর্জন করে।

তাহলে মনিব-মনিবপত্নীর দিক থেকে হারিয়ে ফেলার বোধটাই পরম প্রাপ্তি। রিখিয়ার টিলায় অরণ্যবেষ্টিত এক পরিবেশে 'নিরহঙ্কার মনিব মহাশয়' সুঘরাইকে আবিষ্কার করেন 'মিসিং লিঙ্ক' হিসাবে (কমলকুমার, ২০০২ : ২৯৫-৩০০)। যে 'ল্যভ লেটাঃ' টুকরা টুকরা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, যে টুকরা খোলামকুচি মানব-অভিজ্ঞতার অংশবিশেষমাত্র বিবৃত করতে পারছে, তার সামগ্রিকতা তৈরি হচ্ছে না কিছু একটার অভাবে। মনিব ও মনিবপত্নী তাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ভক্তি আর ঐকান্তিকতায় সুঘরাইতে সেই 'মিসিং লিঙ্ক' খুঁজে পান। সেই অরণ্যবেষ্টিত আদিম পরিবেশে, সরল আর প্রাকৃত বালকের মধ্যে। কিন্তু এ কোনো চিরন্তন প্রাপ্তিযোগ নয়। বৈদ্যনাথের মেলায় মনিব সুঘরাইকে খুঁজে পায় না। আর পরে তো খোদ সুঘরাইই নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক উপন্যাসের বিশেষ প্রেক্ষাপট অবশ্যই বাংলা ও বাঙালি। বিশেষত বাংলার ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতাজনিত সংকট। কিন্তু 'খাঁটি বাঙালিত্ব' বা 'প্রাক-ঔপনিবেশিক বিশুদ্ধতা'র কোনো আকাঙ্ক্ষা এই কাহিনিতে প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। 'মিসিং লিঙ্ক' সুঘরাইয়ের বিচ্যুতিই এর কারণ। সুঘরাইয়ের প্রতীকী সম্ভাবনা বরং উপন্যাসটিকে তাৎপর্যের দিক থেকে প্রসারিত করেছে। এক সর্বমানবিক সত্যে উপনীত করেছে। নিজ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্যুতি মানুষকে স্বভাবচ্যুত করে। আরোপিত শৃঙ্খলা শৃঙ্খল হয়ে মানুষের প্রাণবন্ততা নষ্ট করে, সহজযোগের সামর্থ্য শেষ করে দেয়। 'সাধারণ' হয়ে সে 'সরলতা' হারায়। হারিয়ে ফেলার বোধ আর পুনরুদ্ধারচেষ্টাই হয়ত তাকে অব্যাহতভাবে 'মানুষ' করে রাখে।

৬

ভাষার কিছু বহিরঙ্গীয় জটিলতা যদি কমলকুমার এড়াতেনও, অন্তরঙ্গ জটিলতা থেকেই যেত। কারণ তাঁর প্রস্তাবে এমন জটিলতা আছে, যা ভাষার জটিলতা দাবি করে। বঙ্গীয় আধুনিকতার যে অনুমানগুলো বাংলা সাহিত্যের ভাষা তৈরি করেছে, তিনি তাঁর প্রস্তাবে সেগুলোর অনুসরণ করেননি[১৭]। আবার এমন জীবনের ছবিও আঁকেননি, যা অন্য কোথাও বাস্তবত হাজির আছে। তাঁর বাস্তব নির্মিত বাস্তব। তাঁর সাধনা প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়ার সাধনা নয়। এ সংস্কৃতিরই সাধনা, যে সংস্কৃতি প্রকৃতি, ভূমি আর ঐতিহাসিক ভাবলোক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সে এক কৃত্রিম নির্মাণই বটে। তাঁকে এত নতুন সংজ্ঞায়নের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যে, বয়ানের প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ধারায় তাঁর গল্প বলা হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভাবলোকে যেমন, ভাষায়ও তিনি তেমনি পুরনো বাংলার সাথে নানামাত্রিক গভীর যোগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। 'ভাব প্রকাশ বিষয়ে' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর আর মধুসূদন প্রসঙ্গে এই যোগ সম্পর্কে তাঁর অভিমত পাওয়া যায় (কমলকুমার, ২০০৯ : ২৬৩)। *সীতার বনবাসে*, তাঁর মতে,

বিদ্যাসাগর 'ব্রাহ্মণ্য ধ্বনিব্যঞ্জনার সহিত বাঙলার ব্যাকুলতা' চাতুর্যের সাথে মিশিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে দেখান 'আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে', 'আমার মাথা খাও আর্য্যপুত্রের দোহাই' ইত্যাদি। মধুসূদন থেকে উদাহরণ দেন : 'যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,/মোর কিরে প্রাণেশ্বর!/ ... বালাই লইয়া তবে মরি'। তাঁর ব্যাখ্যা : 'এখানে 'কিরে' মানে দিব্যি, বালাই অপরিহার্য্য এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে।' *পিঞ্জরে বসিয়া* শুকসহ তাঁর অপরাপর রচনায় আরো গভীরতর অর্থে 'খাঁটি' বাংলার ব্যবহার আছে।

কিন্তু সত্য হল এই যে, কমলকুমার মজুমদারের রচনা উত্তরকালে অনুসৃত হয়নি। আমাদের প্রস্তাব, অনুসৃত না হওয়ার জন্য তাঁর গদ্যের 'দুরূহতা' যতটা দায়ী, বিষয়ের 'অচলিত, অস্বস্তিকর' নতুনতার দায় তার চেয়ে মোটেই কম নয়।

টীকা

১. কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : 'বাংলা কথাসাহিত্যের দুরূহতম লেখক কমলকুমার মজুমদার ...'। (রফিক, ২০১১ : ২)
'কমলকুমারের অন্য যে কোনো উপন্যাসের চেয়ে এ উপন্যাসের বুনন যেমন জটিল তেমনি ভাষাও অধিক নিরীক্ষাপ্রবণ।' (শোয়াইব, ২০০৯ : ১৩৯)
'... এটি উপন্যাস। এবং এযাবৎ বাংলা ভাষার একটি দুরূহতম উপন্যাস। দুরূহতম শুধুই এর তথাকথিত 'আর্কেয়িক' ভাষাশৈলীর জন্য নয়, বরং তার আধেয়-স্বরূপ 'ভাবময়ী তত্ত্ব'-এর জন্যও।' (বীরেন্দ্রনাথ, ১৯৮৫ : ১০৬)

২. 'কমলকুমারের গল্প উপন্যাসে ঘটনার যুক্তিহীনতার কোনো প্রশ্রয় নাই। ঘটনাক্রমের যুক্তি শৃঙ্খলায় সেখানে কোনো দুর্বল সন্ধি থাকে না। গল্প নির্মাতা হিসাবে অলঙ্ঘ্য নিয়মের শাসন তিনি যে মেনে নেন, তাতেই প্রমাণ তাঁর রচনা স্বাধীন বিলাস মাত্র নয়।' (দেবেশ, ২০১৩ : ১১৪)

৩. কথাটি ব্যবহার করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৩)।

৪. 'কমলকুমার তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রায় কোনো সময়ই এমন ব্যক্তিগত থেকে শুরু করেন না। তাঁর কাজ অনেক সময়ই ভিড় নিয়ে, বা জনসমষ্টি নিয়ে, বা ভূখণ্ড নিয়ে। সেখান থেকে তাঁর গল্পের সুবাদে একটা বা দুটি চরিত্র প্রধান হয়ে উঠে আসে। উঠে আসার পরও কিন্তু তাঁরা সেই বৃহতেরই অংশ হয়ে থাকে।' (দেবেশ, ২০১৩ : ১০৯)

৫. রিখিয়ায় কমলকুমার মজুমদারদের বাড়ি ছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক ব্যবহার সম্পর্কে হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :
[১৯৪১ সালে] জাপানি বোমার ভয়ে সপরিবারে রিখিয়া যাত্রা। রিখিয়া কমলকুমারের কাছে কেমন ছিল তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। তিনি লিখেছেন, 'কমলবাবু জাঁ রেনোয়াকে রিখিয়া যাওয়ার কথা বলেছিলেন। ফরাসিতে রিখিয়ার যে বর্ণনা তাঁকে দিয়েছিলেন তার ইংরাজি করলে দাঁড়ায় plenty of sun, plenty of rain and innumerable silence।' রিখিয়াতেই কমলকুমার দেখেছিলেন মানুষকে জীবনকে, 'অগণিত ছোটলোকের ঘর্মাক্ত কলেবর', কুলিকামারির শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন, জেনেছেন — এখানে মানুষ তাকেই সুখী বলে জানে যে বর্তনে খায়, বালিশে ঘুমায়; দেখেছেন সৌন্দর্যের কুৎসিত প্যারডি, আর গেরি-হরিৎ-কমলার চলমান রং; প্রকৃতিকে বিসর্জনকারী চেঙ্গার। নিত্যদিন দেখেছেন বাড়ির পিছনে বিরাট প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের তলায় 'অনেক সমাবেশ, অনেক খাটিয়া, অনেক হুঁকা, অনেক ধোঁয়া, অনেক কাশির শব্দ, অনেক কথাবার্ত্তা; ... ছোট না-জলচর জাতির সম্মেলন।' দেখেছেন, 'একদা মধ্যরাত্রে তদীয় স্বামীকে' হত্যাকারী যুবতী। অনুভব করেছেন রিখিয়ার আকাশে 'চির ব্রাহ্মণ্য, মৃত্তিকা বিস্তার হয় উৎসবময়ী ফোয়ারা।' (হিরণ্ময়, ২০১১ : ৫৬)

৬. কমলকুমার মজুমদারের ভাষারীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ চেতনাপ্রবাহরীতির কথা বলেছেন। সংজ্ঞাটি এক্ষেত্রে খুব সীমিত অর্থে প্রযোজ্য। বহির্জগতের নিখুঁত বর্ণনা এ ভাষার এক কুললক্ষণ। এর বাইরে চেতনাপ্রবাহরীতির সাথে এর প্রধান আরেকটি ফারাক লেখকের মূল্যায়নসূচক স্বরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি।

৭. কমলকুমার মজুমদার প্রায় সারাজীবন ছবি এঁকেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়েছিলেন ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়ার *দি রিভার* ছবির শুটিংয়ের সময় (হিরণ্ময়, ২০১১ : ৫৯)। অবশ্য এসব ছাড়াও ভাষায় চলচ্চিত্র বা চিত্রকলার কৌশল ব্যবহার হয়ত সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল বলেই মনে হয়। তাঁর ভাষার চিত্রগুণ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের দুটি মন্তব্য : ক) 'কমলবাবু একজন আর্টিস্ট, কমপ্লিট আর্টিস্ট। ক্যামেরা-তুলি চালিয়ে উনি ভাষায় চিত্র আঁকেন।' (সত্যজিৎ, ১৪২০ : ১৮১) খ) 'আর্টের কথা বলতে গিয়ে তাঁর জ্ঞানের বাইরেও যে জিনিসটা মুগ্ধ করত সেটা হল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আপাততুচ্ছ দৃশ্যের মধ্যে থেকেও তিনি যেসব ডিটেল আহরণ করতেন — যেটা পরে তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল — তা ছিল বিস্ময়কর।' (সত্যজিৎ, ২০১৩ : ২৮)

৮. 'উপন্যাসকে ক্রমান্বয়িক বা ধারাবাহিক বা স্তর-পরম্পরায় গড়ে না-তুলে সামগ্রিক একটিমাত্র নির্মাণে পরিণত করা কমলকুমারের ফর্মের প্রধান লক্ষণ' (দেবেশ, ১৯৮৪ : ৫২)। কাজটা তিনি করেন বিভিন্ন অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্ত ব্যবহারে। একারণেই 'কমলকুমারের বাক্যে উপন্যাসের প্রসঙ্গের সঙ্কেতও খুব বেশি — প্রসঙ্গচ্যুত সেই অংশের কোনো অর্থবোধ নাও হতে পারে আচমকা উদ্ধৃতিতে'। (দেবেশ, ১৯৮৪ : ৫৯)

৯. এই যে অনুষঙ্গের স্থানান্তর আর বহুবিচিত্র ব্যবহার, তা দুরূহতাসৃষ্টির আরোপিত কৌশলমাত্র নয়। যে সমগ্রতার মধ্যে কমলকুমার ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনাকে ধরতে চান, সেই সমগ্রতাই দাবি করে, ভবিষ্যৎ আর অতীত বর্তমানের সাথে একাকার হয়েই থাকে। সময়ক্রমের লঙ্ঘনও এর অন্যতম কারণ। আর 'দ্বিতীয়বার' পড়া সম্পর্কে বলা দরকার, যে কোনো টেক্সট সম্পর্কেই তাৎপর্যের দিক থেকে কথাটা সত্য। যে কোনো বয়ানেই পরের ঘটনা আগেরটির তাৎপর্যগত পরিবর্তনের কারণ হয়। কমলকুমার সম্পর্কে কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য। কারণ, তাঁর বয়ানে পূর্ববর্তী তো বটেই, পরবর্তী অনুষঙ্গের ব্যবহারও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আর তিনি ব্যবহারটা ঘটনা আকারে করেন না, করেন ঘটনা থেকে তৈরি করে নেয়া 'সংজ্ঞা' আকারে।

১০. সুঘরাইয়ের এই ডোম-অস্তিত্বজনিত বাস্তবতা লেখক বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

ক) হায় আমি ঝড়ের মুখে এঁটো-পাতারও অধম! (কমলকুমার, ২০০২ : ২৭৮)

খ) তোমরা জাঙকীর মতই পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ বহিতেছ; (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮০)

গ) যদিও তাহাদের ভিক্ষা সংগৃহীত হয় না (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮০)

ঘ) হায় ডোমেদের দীর্ঘশ্বাস আছে! (কমলকুমার, ২০০২ : ৩২৮)

ঙ) পাপ কোথায় ... বেচারীর নিয়তি পর্য্যন্ত নাই। (কমলকুমার, ২০০২ : ৩৩৬)

১১. রফিক কায়সারের (২০১১) পুরো আলোচনায় এই বিভ্রান্তি নজরে পড়ে। টেক্সটের অভিপ্রায়কে যথেষ্ট মূল্য না দিয়ে পাঠকের পরিচিতির বলয়ে পাঠ-নির্ধারণের কারণেই তিনি কমলকুমারের 'বিষয়' আর 'ভাষা'র মধ্যে কোনোরূপ সমন্বয় খুঁজে পাননি।

১২. কমলকুমার তাঁর সার্বিক বয়ানভঙ্গিতে এমন এক পর্দা এঁটে দিতেন যে, তাঁর গল্পগুলোর সময়কাল নিয়ে সংশয়ের অবকাশ তৈরি হয়েছে। আদতে অধিকাংশ রচনাই বিশ শতকের প্রথমাংশের পটভূমিতে রচিত। *পিঞ্জরে বসিয়া শুকে* কাহিনিকাল নিয়ে অনেকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে। সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে 'আগের বছরে'র (১৯৩৪) ভূমিকম্পের উল্লেখে (কমলকুমার, ২০০২ : ২৮৬), যা থেকে বোঝা যায়, এ কাহিনি ১৯৩৫ সালের।

১৩. নিজের সম্পর্কে কমলকুমার একবার লিখেছিলেন: 'আমরা এমত সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে গোঁড়া বাঙালিত্ব আছে' (কমলকুমার, ২০০৯ : ১৫৬)। নিজের এবং অন্যদের সম্পর্কে তাঁর এ ধরনের মন্তব্য বিস্তর পাওয়া যায়। *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক উপন্যাসে তাঁর মনোনীত চরিত্র, যেমন মনিব বা মনিবপত্নীর বর্ণনায় সমধর্মী উল্লেখ সংখ্যায় প্রচুর, ব্যবহারের দিক থেকেও ইতিবাচক।

১৪. ইতিহাস, মূল্যবোধ, প্রগতি বা মানুষ সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞার বিচারে মনে হতেই পারে যে, কমলকুমারের দুরূহতা স্বেচ্ছাকৃত। মনে হতেই পারে, কমলকুমার একরাশ বৈপরীত্যে আক্রান্ত। যেমন মনে হয়েছে নবনীতা দেবসেনের :

'তাঁর ভাববার মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। কখনো তা অত্যন্ত মানবিক জনদরদে পরিপূর্ণ উদার, সংবেদনশীল। দরিদ্রের ওপরে ধনীর সামাজিক অত্যাচার, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সম্মুখগামী ভাবনা।

আবার কখনো তা শ্রেণী বিভাগে বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী, বংশমর্যাদায় বিশ্বাসী, অতি-হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমকালবিরোধী, আধুনিকতাবিরোধী, ধর্ম-আচার পরায়ণ, পশ্চাদমুখী ভাবনা।' (নবনীতা, ১৯৯৩ : ৩৮)

১৫. 'বাঙালি সংস্কৃতি কমলকুমারের রচনায় অনার্য জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কমলকুমারের হিন্দুত্বের ধারণা রবীন্দ্রনাথের মতো *উপনিষদ* নির্ভর নয়, বঙ্কিমের আর্যসংস্কার কমলকুমারের হিন্দু চেতনায় কোনো ছাপ রাখেনি। কমলকুমারের হিন্দুচেতনা লোকায়ত ও পৌত্তলিক দর্শনজাত। আর্য, বৌদ্ধ, হিন্দু ভারত নয়, মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্য এবং উনিশ শতকের রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন লেখকের হিন্দুত্বকে প্রভাবিত করেছে'। (রফিক, ২০১১ : ৮)

১৬. "কথা ইসারা বটে' ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন' প্রবন্ধে কমলকুমার বাঙালিত্বের নমুনা ও উদাহরণগুলো তালিকাবদ্ধ করেন এভাবে : সংস্কার, ধর্ম, দেশাচারের প্রতি শ্রদ্ধা, গঙ্গা দেখলে সুখানুভূতি হওয়া, মন্দির দেখলে সৌভাগ্যবান মনে হওয়া, অন্য দূর দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে বাংলাভাষা শুনলেই অনৈসর্গিক মায়া সঞ্চারিত হওয়া, সর্বোপরি, যেখানে 'ভক্তির পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য' হাজির। এরপর লিখেছেন : 'আমরা যে বিরাট ভক্তির ঐতিহ্যের ধারক, যে দেশে মহাপ্রভু আসিয়াছেন, যেখানে ভগবান রামকৃষ্ণ ছিলেন, আমরা সেই দেশেরই, ... ইহা সুনিশ্চিত যে বহুজন্মের সুকৃতির কারণে আমরা বাঙলাদেশে জন্মিয়াছি — আর তাঁহারা বাঙলায় কথা কহিয়াছেন!' (কমলকুমার, ২০০৯ : ১৫৬)

কমলকুমার এই ভক্তিকে পশ্চিমাগত আলোকায়নযুগের 'যুক্তি'র বিপরীতে স্থাপন করেছেন। 'আধুনিক' লেখকের এহেন 'অনাধুনিক' প্রস্তাবে অনেকেই — চিন্তার অনভ্যস্ততা ও অনুদারতার কারণে — অস্বস্তি বোধ করেন। ফলে তাঁরা বলতে চেয়েছেন, কমলকুমারের উপন্যাসে রামকৃষ্ণের উল্লেখ টেক্সটের সাথে সম্পর্কিত নয়। আদতে এই সিদ্ধান্তে নিষ্ঠ থেকে উপন্যাসগুলোর ভাবলোকে পৌঁছা অসম্ভব। উল্লেখ্য, *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক উপন্যাসের ভাবলোককে কমলকুমারের ভক্তিযোগের গুরুত্বপূর্ণ নমুনা হিসাবে পড়েছেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত (১৯৮৫ : ৬৩-১২৩)।

১৭. এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য : 'কমলকুমার তাঁর বীক্ষা ও ভাষায় ঔপনিবেশিক বাস্তবকেই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ বঙ্গীয় রেনেসাঁস নামক ঘটনাটিকেই এড়িয়ে যেতে চান। উনবিংশ শতাব্দী থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির লেখার ভাষাকেই, উপন্যাসের গল্প বলার ভাষাকেই আক্রমণ করলেন।' (পার্থপ্রতিম, ১৪২০ : ৯৭-৯৮)

গ্রন্থপঞ্জি

অলোক সরকার ১৯৯৩, 'কমলকুমার মজুমদারের মানুষ ও ভাষা', *নানা দৃষ্টিতে কমলকুমার মজুমদার*, সম্পাদনা : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, সমতট প্রকাশন, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার ২০১৩, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ঘোর বাস্তবতা', *কমলকুমার : সৃষ্টিবৈচিত্রের খোঁজে*, শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

কমলকুমার মজুমদার ২০০২, *উপন্যাস সমগ্র*, আনন্দ, কলকাতা।
কমলকুমার মজুমদার ২০০৯, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, চর্চাপদ, কলকাতা।
দেবেশ রায় ১৯৮৪, *সময় সমকাল*, অন্বেষা, কলকাতা।
দেবেশ রায় ২০১৩, 'তেইশ বছর আগে-পরে', *কমলকুমার : সৃষ্টিবৈচিত্রের খোঁজে*, শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
নবনীতা দেবসেন ১৯৯৩, 'একটি মেট্রোপলিটন শিল্পীমন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের উদাহরণ : কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে দু একটি ভাবনা', *নানা দৃষ্টিতে কমলকুমার মজুমদার*, সম্পাদনা : অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, সমতট প্রকাশন, কলকাতা।
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪২০, 'কমলকুমারের ভাষা', *কবিতীর্থ*, সম্পাদক : উৎপল ভট্টাচার্য, কলকাতা।
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ১৯৮৫, *কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার*, নবার্ক, কলকাতা।
রফিক কায়সার ২০১১, *কমলপুরাণ*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।
শোয়াইব জিবরান ২০০৯, *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
সত্যজিৎ রায় ১৪২০, 'সাক্ষাৎকার', *কবিতীর্থ*, সম্পাদক : উৎপল ভট্টাচার্য, কলকাতা।
সত্যজিৎ রায় ২০১৩, 'কমলবাবু', *কমলকুমার : সৃষ্টিবৈচিত্রের খোঁজে*, শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ২০১১, *কমলকুমার মজুমদার : মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব*, কবিতীর্থ, কলকাতা।

[কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে (১৭.৪.২০১৪) প্রবন্ধটি পঠিত]